

একটি জাদা বক

আফজাল হুসাইন জাফিন



কোন এক নিস্তরঙ্গ সন্ধ্যা। সব পাখি ঘরে ফিরেছে। জীবনের সব লেনদেন শেষ করেনি আমাদের হতভাগী সুতিয়া নদী। বসন্তের পুষ্পরাজি শেষ করেছে আজকের সুবাস বিনিময়। রাস্তার পাশে ধুলিমলিন মটকিলা আর ভাঁটফুলের গাছে সর্বশেষ ধূলিকণাটি এসে এইমাত্র আছড়ে পড়েছে। গাছে ফুটেছে লাল আর সাদা ভাঁটফুল। ভেতরে বৃত্তাকার নবপ্রস্ফুটিত পুষ্পরেণু।

আকাশে প্রদীপ্ত ফাল্গুনের চাঁদ। চারদিকে ফিনিক ফোঁটা জোসনা। যেই জোসনায় খালি পায়ে ঘর ছাড়তে ইচ্ছা করে, সেরকম জোসনা। এই জোসনায় আমি অনুভব করছি শূন্যতা।

মনে হচ্ছে আমার একটি কর্মক্ষম হাত আজ আমার সাথে নেই।

আমাদের ইউনিয়নের নাম পাইথল। পাইথল ইউনিয়ন হলো গফরগাঁও এর প্রকৃতিকন্যা। তাকে পেঁচিয়ে রেখেছে শান্ত নাগিনীরূপী সর্পিলাকার নদী শীলা। আছে দখিনা হাওয়ার মাঠ, জোসনার প্রান্তর আবর আলী, গয়েশপুরের কাচারীর কাঠ মহলের নির্মল ছায়াঘেরা জলশ্রী, তিন শতাব্দী ধরে স্থির দণ্ডায়মান বটতলার কালচে খয়েরী বটবৃক্ষ। আর দুঃখিনী ব্রহ্মপুত্র-কন্যা সুতিয়া বয়ে গেচঘে এই ইউনিয়নে পাশ দিয়েই। সেই হারিয়ে যাওয়া হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতার সাক্ষী হয়ে আজো এই নদীর পাড়ে পৌত্তলিকেরা পুতুল গড়ে পূজা দেয়।

দেউলপাড়ার গাঙেয় অবাধ সাতারী জলধারা। শহীদ নগরের শান্তির বেসাতি খৌরাইল বিলের চলাৎ ছলাৎ নৌকার স্রোতধারা। আছে রোরান বিলের উদ্ভাসিত কড়ইতলা।

এই প্রাকৃতিক প্রান্তরে আমরা ঘুরেছি। রত্নময় দিনগুলোতে আমরা পার করেছি শ্রেষ্ঠ সময়। কথা হয়েছে বিস্তর। মন মনখারাপের দিন গুলোতে ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে তাকে পেয়েছি।

ছেলেটির নাম রোমান। সে আজ চলে যাচ্ছে। দেশের সেনাবাহিনী তার মতো একজন বিশ্বস্ত সেনা পাবে, সেটা তাদের গৌরবের অধ্যায়ে আর কিছু পরিচ্ছেদ যুক্ত করবে বলে আমি

মনে করি। দীর্ঘ নয়টি মাস সে জীবনের জন্য, দেশের জন্য এক মহান ব্রত নিয়ে সে যাচ্ছে।

একটা বেদনাসিক্ত আনন্দ কাজ করছে মনে।

আমরা কতবার খৌরাইল বিলে নৌকা নিয়ে মেতে উঠেছি উল্লাসে। গান গেয়েছি দরাজ গলায়। বিল্লালের দোকানে তাসিন, নাসির,রোমান আর আমি কতবার গিয়েছি ক্যারাম সন্ধ্যা কাটাতে। সেখানে লাল গুটি পকেট করার আনন্দ-দুঃখ মিশেছে হৃদয়ে।

আমাদের মসজিদের পশ্চিমাকাশে সূর্য হেলে পড়েছে। আসরের আজানের পর আমরা যুক্ত হয়েছি মসজিদের মাঠে। আমরা আমরাই নামে আমাদের একটা পাড়ার গ্রুপ আছে। সেখানে এলাকার খেলা,আড্ডা, তেতুল গাছে উঠা, নৌকা দৌড়ানো বা ঘুরাঘুরির প্ল্যান হয়। দেশ বিদেশ থেকে আমাদের পাড়ার ছেলেরা যুক্ত আছে সেখানে। জীবন যেখানে যেমনই থাক, এখানে মুটামুটি একইরকম।

আসরের পর খেলি আমরা। কারা আসছে আসবে তা গ্রুপে আলোচনা হয়েই যায়। গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা হাস্যকর কিছু ছবিটিবি পোস্ট করে হাসি আমরা অনেকই।

২

নির্মল আকাশের নিচে বসে আছি। ইদানিং খুব মুড সুইং হচ্ছে। অজানা কারনে হুটহাট মন খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একটা তিরিক্ষি ভাব সবসময় ঘিরে ধরেছে। স্বভাবসুলভ যে কোমলভাব আমি মানুষের সাথে বজায় রাখি, হাসিমুখে বলি, "কেমন আছো?"।

সেই ভাবটা আর আসে না। শেখ সাদী রহিমাহুল্লাহ একবার বলেছিলেন, " মানুষের সংস্পর্শ হৃদয়কে শক্ত করে দেয়।" আল্লাহর সংস্পর্শ মানুষের হৃদয়ে সৌন্দর্য আনয়ন করে। ধার্মিক লোককে আমরা সেজন্যেই নির্মল হাসি হাসতে দেখি। আমার পিতামহ আবুল হাসেম দগুরী। তিনি প্রায়ই হাসেম দিঘির পাড়ে বসতেন। এলাকার বিচার,জমি,বিষয় আশয় নিয়ে বসতেন। ৯৬ বছর বয়সে তার নির্মল হাসি সকলের হৃদয় ছুঁয়ে যেতো।

আহা! কি ধার্মিকই না তিনি ছিলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি, তিনি এলাকার পাখিদেরকে নিজ হাতে খাওয়াতেন। পাখিগুলো তার উপস্থিতি ভয় পেতো না। কিচিরমিচির শব্দ যেন ছিল আনন্দের হর্ষধ্বনি।

আমার মনে হয়। মানুষের বা সৃষ্টির সেবা না করতে পারলে মানুষের মন খারাপ হয়। আমি হয়ত আর সেবার মানসিকতায় ছুটে যাই না। জীবনের কথা ভেবে সেবা ভুলে গেছি। অর্থের খোঁজে শান্তির পায়রার পাখা ঝাপ্টানোর শব্দ আমার কানে আসে না।

এই কি আমার অশান্তির কারন? হেক্টর গার্সিয়া তার বিখ্যাত গ্রন্থ ইকিগাই এ বলেছিলেন, "মানুষ কি পেতে চায়, আর কি পেয়েছে, এই দুইয়ের পার্থক্য থেকেই সৃষ্টি হয় ডিপ্রেশনের।

সেটি ভুল মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে স্রষ্টার সাথে দূরত্বই ডিপ্রেশনের কারণ।

আকাশের উপরে আকাশ থেকে বেদনার বাণ ডাকছে। আমাদের কাছে দাদার সেই পাখিগুলো আসে না। তাকে ভালবাসতো, আমাদেরকে ভয় পায় বা ঘৃণা করে। দিনের শুরুতে যারা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে আসতো, তারা আমাদের কাছে আসে না। রমজান মাসটি যে উদ্দিপনা নিয়ে আমাদেরকে উল্লাসিত করতো, আজ সেই দিনগুলো যেন আতঙ্ক অনেকের কাছেই।

৯৫ বছর বয়সে আমার দাদা যেই নির্মল হাসি, মানুষের ভালবাসা, সংগ্রামী জীবন ও প্রেমময় সহানুভূতি নিয়ে গ্রহান্তর হয়েছেন, এই যুবক বয়সে আজ আমরা জীবন বিষাক্ত করে ফেলছি। জীবন থেকে পালাতে চেয়ে আমাদের যুবকেরা আজ আত্মহননের পথ খুঁজে।

আহারে জীবন! বেদনার কত রূপ এই ছোট্ট গ্রহে!

৩

আব্বা বাজারে গেছেন। সেখানে ঘর বানানো হবে। দোকানঘর। একটা ঘর ভাঙ্গা হচ্ছে সেখানে। সেখান থেকে স্বপ্নতরী বিদ্যানিকেতন এর বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান শোনা যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার জনাব একরামুল সাহেব। তিনি বেশ যত্নে বছর বছর ধরে স্কুলটিকে

লালন করছেন। মহামারীর বছরটিতেও তিনি বেশ সন্তর্পনে স্কুলটি পরিচালনার ত্রত নিয়েছেন। মতিন মাস্টার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নামে একটা ইংরেজি ভাষনের স্কুল তিনি এই মফস্বলে দাঁড় করানোর প্রয়াস চালিয়েছেন।

সন্ধ্যার সূর্য কোদালিয়া বিলের ওপারে রেইনট্রি গাছের আড়ালে অবস্থান করছে। আশেপাশে লাল আভা ছড়িয়ে আছে। বিলের পাড়ে অব্যবহৃত ফসলের মাঠ। এই মাঠে কত দৌড়েছি। ঘুরেছি পাখির বাসার সন্ধানে। ঘুঘুর পাখার নিচে কেটে গেছে আমাদের দুরন্ত শৈশব। কুস্তি করেছি, ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছি। বন্ধুদের সাথে আড়ি কেটেছি। সন্ধ্যায় গলাগলি করে ফিরেছি বাড়ি। অনাহার, আতিকুল, শরিফ, এনামুলরা ছিলো এই অঞ্চলের সাথী।

বিলপাড়ের জঙ্গলবাড়ি মাঠে আজ ফুল পিচ খেলা হচ্ছে। সাথেই একদল ছেলে মেয়ে দাড়িয়াবান্ধা খেলছে। অন্তত এই একটি দেশীয় খেলা আমাদের এলাকায় ছেলেমেয়েরা ধরে রেখেছে। অবশ্য আমি ডাংগুলি খেলাটি কীভাবে খেলতে হয়, সেটি শিখিয়েছি।

মাগরিবের সময় হয়েছে। দিকে দিকে আজান হচ্ছে। সব পাখিরা নীড়ে ফিরছে। শুধু একটি ক্লান্ত বক এসে থমকে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের শক্ত কাঁঠাল গাছে।

এই গাছটির নাম কেন শক্ত কাঁঠাল তা বলা যাক। প্রকান্ড মোটা একটা পুরনো কাঁঠাল গাছ। ছাল-বাকল মরে ফোম হয়ে আছে। এই গাছ বেয়ে উঠা সাধারণ কোন ঘটনা নয়। তবে আশার কথা হলো গাছটি অত লম্বা নয়। মই দিয়ে, আতাগাছ দিয়ে বা সুপারী গাছ বেয়ে অনায়াসে এই গাছে চড়া যায়। বেশিরভাগ লোকই গাছ দিয়ে উঠে। কারণ, লুপ্তী পড়ে সুপারী গাছে হেঁচড়ে উঠলে কোন সময় যে তা মঞ্জিলে মকসুদ দৃশ্যমান করবে তার ঠিক নেই! তবে ওজন বেশী হলে সেটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠে। নিচে দিঘি।

কোদালিয়া বিলের ওপারে কড়ইগাছের সারির আড়ালে সূর্য ডুবে গেছে। আঁধার নেমেছে। বিলের কাছেই আরবী বাড়ি মাদ্রাসা। সেখানে দীপ্তিমান আলোয় আল্লাহর কালামের বেশ কিছু বিদ্যার্থী মাথা ঝুঁকাচ্ছে। তারা পড়ছে। সেই পড়া এই অঞ্চলে এক অদৃশ্য পবিত্রতার চাদর দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

আবছা অন্ধকারে রাস্তার পাশে একশো কোটি সাদা, লাল ভাঁটফুল যেন প্রত্যাগমনকারী পথচারীদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সন্ধ্যার শেষাংশে ঘরে এসেছি। পাখিরাও ঘরে ফিরে গেছে। শুধু এই বকপক্ষী দাঁড়িয়ে আছে একা। এই পাখিটি কী আমার হারিয়ে যাওয়া বক? যার জন্য বিশটি বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছি!

কাঁঠাল গাছটিতে টকটকে লাল কাঁঠাল হয়। কোষগুলো কমলা রঙের। আর একটা মাঝারী ধরনের শক্ত। এই জাতের কাঁঠাল আমাদের সমগ্র বংশে পছন্দের শীর্ষে। আমি সাধারণত কাঁঠাল খেতে অপছন্দ করি। তবে, এই কাঁঠালগুলো আমার প্রিয়। এই জন্যই মূলত এই গাছটিকে শক্ত গাছ বলা হয়।

বকটির কথা মনে হতেই আমার মনটা ছাঁত করে উঠলো! আজ থেকে ২০ বছর আগে। ২০০৪ সাল। আমরা একটা বিপন্ন বকের ছানাকে উদ্ধার করে আনলাম। কী সুন্দর ছিপছিপে সাদা একটা নান্দনিক বক! জীবনে প্রথমবার একটা পক্ষীর দারুন ভক্ত হয়ে উঠলাম আমি। কি যে সুন্দর এই কানাবগীটা। খাঁচা থেকে বের করে প্রায়ই আমি হাত বুলিয়ে দেই তার। ডানায় একটা রোদের গন্ধ লেগে থাকে। পাখির পাখায় এই গন্ধ থাকে।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে আমি একটা মহাবাজপাখি ধরে আনলাম। আলপিনের মতো সূঁচালো, ব্লেন্ডের মতো ধারালো তার নখ। সে ছিল বিপন্ন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় সেটি নজরে আসে তাসিনের। তাসিন হলো আমার ছোট ভাই। ক্রিকেটার। গয়েশপুর বাজারে তার একটা শপ আছে। খেলাঘর। ক্রিকেট, ব্যবসা, ছবিতোলা, গান গাওয়া ইত্যাদি তার প্রিয় প্যাশন। সে অবশ্য ইদানীং সাধুবাবা সেজেছে। ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ভাত ছাড়া যে কোনো কিছুই তার খাদ্য। কিন্তু ভাতেই তার যত অ্যালার্জি।

"আব্বা, একটা অস্বাভাবিক বড় পাখি মসজিদের সামনে ছটফট করতেছে!" সে একটু নিচুস্বরে বললো।

সাবধান! যাবি না! এইটা সাধারণ কোনো পাখি না। এইটা হইলো জ্বীন। এইটা মসজিদের সামনে আইবো ক্যান নইলে!

আব্বা মুটামুটি একটা ভয় ঢুকিয়ে দিলো মনে। কনকনে শীত। বাইরে যাওয়াই যায় না। এমন সময় একটা জ্বীন দেখে আসার শখ করা যাবে না। আমরা গেলাম না।

আব্বা আবার বললেন, লোকালয়ে কোনদিন পাখিরা মরে না। কোনদিন আশেপাশে মড়া পাখি দেখছিস?

সে বললো, "না! বাবাগো!"

সকালে ফজরের নামাজের পরে মসজিদ থেকে বের হয়েছি। প্রকাণ্ড এই পাখিটি এখনো জীবিত। অতি ঠান্ডায় খুব অসুস্থ হয়ে গিয়েছে বোধ করি। চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হয়নি তার। সোনালী চিল মারা গেলো আমার হাতের উপর। ২টা ছবি তুলে হেলো। পাখা প্রকাণ্ড। তাই কেটে রাখলাম। একটা কবর খুঁড়লাম উত্তরের অরণ্যে। পাখিটিকে কবরে রেখে বললাম, "তোমার মতো আমাদের ও ফিরে আসতে হবে প্রভুর কাছে। বিচার দিনে তুমি আর আমাদের বকের সাথে দেখা যেন হয়!" বলতে বলতে আমার চোখ ছলছল করে উঠলো। আমার বকপক্ষীটার কথা মনে হলে আমার মন খারাপ হয়। এমন ভালো কি আমি কখনো কোন নারীকে বেসেছি? বা কোন নারী বেসেছে আমাকে?

8

আজ কী বার মনে পড়ছে না। পুকুর তকতকে পরিষ্কার। পানি টলমল করছে। এক সময় আমাদের দুঃখিনী সুতিয়া নদীর নাম ও ছিল স্রোতস্বিনী। আজ তার গভীর অসুখ। রাঘব বোলেরা বিষ ঢালছে। উপমার বিষ নয়, একেবারে বাস্তবের বিষে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে এই জলরাশি। হাজার হাজার কোয়াসেক পানি হয়ে আছে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। এই দেশ সত্যিই বড় আশ্চর্য!

রমজান মাসে কাফিরের দেশেও মূল্য অর্ধেক থাকে দ্রব্যের। এদেশে এক সপ্তাহ আগেই দাম বাড়ায় ব্যবসায়ীরা। আর লাগামহীন দাম বাড়লে পিঁয়াজ খাওয়া ছেড়ে দেন রাষ্ট্রপ্রধান। নিজে এত ত্যাগ স্বীকার করেও চোরদের চুরিতে যেন কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য তারা সদা তৎপর।

ক্লীবতার নাটকীয়তা একে বলা যেত। কিন্তু সেটা বলার জো নেই। কারণ দুর্বলের ওপর এদেশে খড়গহস্ত। সুপারী চুরির অপরাধে এদেশে আঙ্গুলকাটার ইতিহাস আছে, ধর্ষনের বিচার চাইতে এসে আবার ধর্ষিত হবার ইতিহাস ও আছে। দুর্নীতি দমনের জন্য এদেশে একটা কমিশন আছে। সেই কমিশনের প্রধান পরিচালকের বিরুদ্ধে আবার কোটি টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগ আছে। অভিযোগ আবার প্রমানিতও।

বলদীঘাট স্কুলে ক দিন আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এসছেন। সে উপলক্ষ্যে ১১ টির বেশি তোড়ন। তোড়নে তোড়নে ব্যানার। সেখানের এক ব্যানারে বিরোধী পক্ষ সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "ওরা এজিদের বংশধর!" যে লিখেছে তার বড় ভাই আবার সেই দলের লোক! সব সম্ভবের দেশ, বাংলাদেশ।



কামিনী ফুলের গাছে বেশ কিছু ফুল এসেছে। ফুল কি সুবাস ছড়াচ্ছে? গন্ধ পাচ্ছি না। ইদানিং আমার সর্দি লেগেছে। ধুলাবালি থেকে সম্ভবত সেটা হয়েছে।

বাড়ির সামনে সূতাটুনির বাসাটিতে চারটি ছানা। একটি অন্যটির উপরে শুয়ে দিন কাটাচ্ছে। সুখী, নির্ভয় ও শান্ত একটা জীবন কাটছে তাদের। ফল-মূল খেয়েই তারা দিন চালায়। ২ টা বড়ই এর জুস হলেই তাদের ভরপুর পেট ভরে যায়। মাঝেমধ্যে তাদের ঠোঁটের আঘাতে টসটসে পাকা বড়ই পড়ে মাটিতে। সুস্বাদু সেই বড়ই।

৬

টিনের চালে একটা কবুতর বসে আছে। স্বর্গীয় সাদা তার রঙ। শরতের মেঘ থেকে যেন আছড়ে পড়ছে সেই রঙ। কবুতরের পাশেই একটা কামিনী ফুলের গাছ। সেই গাছে ফুল ধরেছে। স্নিগ্ধ, ঐশ্বরিক সাদা সেই ফুল।

হঠাৎ একটি কোকিল ডাকলো। কুহু কুহু। কামিনীসুলভ ভঙ্গীতে ডাকছে সে। কোকিলের এখন মেটিং সিজন। তাদের মিলনসুর বাজে বসন্তে।

আজ বসন্ত। মার্চ মাস চলছে। এদেশে মার্চ বসন্তের মাস। মায়াবী এই মাসে মানুষ শান্তির জন্য যুদ্ধ লড়েছিল বাংলাদেশে। আমরা সেই বীরের জাতি।

বাড়ির সামনে হাসেম দিঘী। দিঘির জলে জমে থাকা কচুরীপানা সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। স্বচ্ছ জলরাশিতে হাসিতে ভাসছে একগুচ্ছ হংসবালা। প্রণয়লীলা শেষে নাইতে নেমেছেন লজ্জাশীলা, পতিব্রতা, বালিকাবধূগণ।

বাতাসের নির্মল প্রবাহ গাছের পাতায় মর্মর ঝংকার তুলেছে।

এখানে সকাল হয়েছে।

খোঁরাইল বিলে নেমেছে মৎসজীবীরা। হাঁক শোনা যাচ্ছে, "ঢংলান দে! ও হো হো! " জেলেদের মাথার পাশ দিয়ে পূবের আকাশে কমলার মতো লাল প্রভাতদিবাকর উঠেছে। একঝাঁক পানকৌড়ি, ঘুঘু আর অচেনা পাখির কাফেলা উড়ে যাচ্ছে। এই উড়া আসলে মানুষের জন্য একটা দিক নির্দেশনা। তাদের এই উড়ে যাওয়ার একটা অর্থবহ প্রতিক। হে মানুষের বংশধর, জমিনে ছড়িয়ে পড়ো। জীবিকা উপার্জন করো। আল্লাহর পৃথিবী দর্শন করো। চিন্তাশীল হও। জ্ঞান অর্জন করো।

টিনের চালে কবুতরটা এখনো বসে আছে। টিনের চালের পাশে একটা বড়ই গাছ। সে গাছে একটা সূতাটুনির বাসা। এই পাখিটি খুব সম্ভবত বিরল একটি প্রজাতি। কিন্তু প্রতিবছরই মুটামুটি আমাদের বাড়িতে তারা সংসার পাতে। এই সাংসারিক পাখিটি এত সুন্দর করে ডাকে, এত চমৎকার করে খুনসুটি করে, দেখলে মন ভালো হয়ে উঠে।

পুকুরের ঘাটে এলাকার ছেলেরা বসে। মাঝেমাঝে তারা নিজেদেরকে অতি সম্মানিত একটা ভাবে রাখতে চায়। এক সময় বন্ধুদের সাথে গল্প করতাম ঘাসে বসে, মাটিতে একগাছি মটকিলা পাতা রেখে। এখন ছেলেরা মনে করে, যারা চেয়ারে বসে তারা ছাগল! তারা নিজেদেরকে অতি সম্মানিত মানুষ ভাবে। সেক্ষেত্রে তারা যা করে সেটাও ভারি অদ্ভুত!

তারা চেহারে হেলান দেয়ার স্থানটিতে বসে। বসার স্থানে পা দেয়। মাঝেমাঝে যদি বাস্তব ছাগলেরা এখানে উঠেও তারা অবশ্য ছেলেদের বসার স্থানটি চেটে দেয়। ছাগলের অরিজিনাল ছ্যাপের মধ্যে বিশেষ অঙ্গটি ঘসে তারা সম্ভবত একটা নিষিদ্ধ আনন্দ পায়!

খৌরাইলে মাছ ধরা শেষ। মাছের নীল ক্যারেটগুলো মাছ বোঝাই করে চলে যাবে গয়েশপুর বা কাওরাইদ। সেখানে প্রাচীন বাজার। সেই গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আমলে গোড়া পত্তন হয়েছিল এই বাজারের। অবশ্য আরো কিছু জনশ্রুতি আছে। ভাওয়াল রাজার ছেলেরা নাকি স্থানীয় কৃষকনেতাদের সাথে যুদ্ধ করে দখলে এনেছিলেন এই জমি। আর এই গয়েশপুর নাকি এসেছে গয়েশ্বর থেকে।

তবে বাজার হিসেবে নাকি আত্মপ্রকাশ করেছে সাম্প্রতিক এক সংঘাতের সূত্র ধরে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো এক সময়।

বসন্তকালের সকালে সোনালী রোদ উঠে। আজ রোদে যে রঙ মেখেছে গায়ে, সেটা সোনালী। কামিনী গাছের পাতায় সেই রোদ ঠিকরে পড়ছে। গাছের সামনেই আমার রুমের বারান্দা। নকশাদার সেই সোনালী আলো এসে পড়ছে আমাদের বারান্দায়। সেখানে একটা ছোট চৌকি আছে। সেখানে আমি বইটাই পড়ি। আজ পড়ছি, হেঙ্কর গার্সিয়ার লেখা "Ikigai".

জাপানী মানুষ কীভাবে দীর্ঘায়ু লাভ করে থাকে, সে বিষয়ক একটি বই এটি।

এখন আর কোকিল ডাকছে না। এখন ডাকছে একটি ঘুঘুপাখি। কুরু কুরু করে সে ডাকছে। আর কিচিরমিচির করে সারা বাড়ি মাথায় তুলে রাখছে এক সহস্র ভাত-শালিক। ঘুঘুপাখির এই প্রজাতির নাম তেল-ডুহি। সাদা রঙের ডিম ওদের। মুরগীর ডিমের মতো রঙ।

আল আমিন পুকুরে নেমেছে। এখন সে বুদ্ধিমান। চাতুর্য আছে চলনে। বাস্তব জগতের টুকটাক হিংসা, কুটিলতা, মিলে মিশে চলা বা গড়পড়তা সাধারণ গ্রামীণ মানুষের মতোই হয়ে উঠেছে সে। মানসিক বিকারগ্রস্ততা কাটিয়ে কর্মঠ ও স্বতন্ত্র মানুষে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার ক্রিকেটপ্রেম আজোও অমলিন।

গয়েশপুর বাজার সৃষ্টির যে কারণটি লোকমুখে প্রচারিত, সেটি বলা যাক। শীতকাল চলছে। চারদিকে বিবাহের মৌসুম। এই মৌসুমী আবহাওয়ায় একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। অতি রূপবতী এক মেয়ে বসেছে বিয়ের পিঁড়িতে। কিন্তু এই ঘটনায় একজন ছেলে খুবই রাগান্বিত ও উদ্বিগ্ন।

চোখ ধাঁধানো রোদ উঠে গেছে। সবাই কর্মব্যস্ত। খৌরাইল বিলের জলসমতলে মাছেদের খাবার ছড়াচ্ছে আমিন ভাই। জীবনের মায়া সে ত্যাগ করেছিলো ফেব্রুয়ারী মাসে। কোন এক ফেব্রুয়ারীর রাতে, মরিবার হল তার সাধ। তার একটা আখের বাগান আর একটা পেপের। সেখানে কীটনাশকের যে শিশি আছে, তা তার হাতের পাশেই। তার আত্মহুতি দেবার শখ। স্ত্রী রূপবতী। অর্থকড়িও ঢের কম নয়। তবে এ জীবন নিশার স্বপন। তার আর শখ নেই বিশ্ব দেখার। একবার দুবাই গিয়েছিলো সে। কানে সমসময় একটা এয়ারবাড গুঁজে রাখার শখটা তখনকার। সে অবশ্য ইলেক্ট্রিকের কাজ পারে ভালো। দুবাইয়ে সে তাই করতো। মুসলিমা ভাবী লোক ভাল। সহাস্য। আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখেন। তিনি বসেছেন পাশেই। গদগদ করে অর্ধেক শিশি গলায় ঢেলে দিলো আমিন ভাই।

ছেলেটি গফরগাঁও সরকারি কলেজের বর্তমান ভিপি। টগবগে রক্ত। বাঁধ সইলোনা তার। নদীর ওপারে তার প্রেমিকার বিয়ে হচ্ছে। "আগুন জ্বালিয়ে দেবো বাবতা গ্রামে। সব মেরে ফেলবো আমি।" ছেলের নাম জুয়েল। তরুণ, রগচটা স্বভাবের। বক্তৃতা শুরু করলে চোখ মুখ লাল হয়ে যায় তার। বিয়ের আসর থেকে ছিনিয়ে আনলো মেয়ে।

সৃষ্টি হলো বিভেদ। কাওরাইদ রেলস্টেশনে গয়েশপুর থেকে কেউ গেলে পেটানো হয়। বাজার করতে যেতে পারে না এই অঞ্চলের লোকেরা। সেই থেকে গয়েশপুরেও পত্তন হয় আরেকটি বাজারের। গয়েশপুরের বাজার। আর এই কথিত লোকটি আমার জেঠাতো ভাই।

আল আমিন পুকুর থেকে উঠেছে। পুকুরের কচুরিপানা প্রায় তোলা শেষ। জ্বাজ্জল্যমান সূর্যটি অকৃপণভাবে তাপ দিয়ে যাচ্ছে। এই মধ্যাহ্নে আমি শুনলাম খিলপাড়ার ফুফা অসুস্থ হয়েছেন। আমাকে সেখানে যেতে হবে।

খৌরাইল বিলের পাশ ঘেঁসে সড়ক। সড়কের পাশে কড়ই গাছের সারি। রেইনট্রি কড়ই এর গাছ থেকে ঝড়া পাতার মর্মর শব্দ হচ্ছে। খৌরাইল বিলে নৌকা বাঁধা। সেটি বাঁধা আছে জলকড়ই এর শেকড়ে। আকাশের ছায়া পড়ছে খৌরাইল বিলের স্বচ্ছ জলরাশিতে। সেখানে ধুসর কচুরিপানার স্তূপের উপর থেকে উড়ে গেল বকপক্ষী আর এক ঝাক ডাহক পাখি।

পাশেই আমিন ভাইয়ের আখ খেত। তার বিপরীত পাশে আমাদের এই মহল্লার কবরস্থান। সেখানে একটি সাদা পাথরের কবর। যেটি আগ্রহী উত্তরের মানুষদের আগমনের জন্য শান্তির অঘোষিত মাইলফলক। এই কবস্থানের বাসিন্দা হওয়া থেকে বেঁচে ফিরেছে আমিন ভাই।

বিষ খাওয়ার পর বাড়িতে হৈ চৈ। কিন্তু সে অস্বীকার করে। মুসলিমা ভাবী বলে যে, ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। আমি আটকাতে পারিনি। ইমার্জেন্সি রোগীকে হাসপিটালে স্থানান্তর করা হলো। প্রথমে ভালকা। রাত তখন দুটা বাজে। রোগী রাখলেন না তারা। নেয়া হলো ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। অবস্থা যায় যায়। সবাই মুটামুটি নিশ্চিত সে এযাত্রায় আর ধরাধামে ফিরবে না। অবস্থার কোন উন্নতি নেই।

দ্বিতীয় দিন শেষ। তৃতীয় দিনে সে সন্তীত ফিরে পায়। সবাই বলা শুরু করে, "কি যুগ আইলো, বিষেও ভেজাল!"

বিলের উপর একটা কংক্রিটের ব্রীজ। ব্রিজের পাড়ে আসতেই আমিন ভাইয়ের সাথে দেখা। সে একটা বড় আখ আমার জন্য কাটলো। আর তার আখ খেতে আসা চোরদের সম্পর্কে একটা মজার ঘটনা বলা শুরু করলো!

ফুফা ভালই অসুস্থ। তিনি ঘর থেকে বের হতে পারেন না। হঠাৎ তিনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গতরাতে অসুখ উল্টাপাল্টা খেয়েছেন, আজ মাথা ধরেছে। ফুফা-ফুফু দুজনেই ইতালী যাবেন। ভিসাও প্রস্তুত হয়ে গেছে। এমন সময় ফুফা অসুস্থ হলেন। তারা চাইলে ইতালীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। রাজু,রাতুল ও রানা এই তিনপুত্র আছেন ইতালীতে। আর এক পুত্র রাহাত আছে লণ্ডন। কিন্তু তারা স্বদেশ ছাড়ছেন না।

আমিন ভাই শুরু করলো, বুঝালা, বিশেষ করে মাহফিলের দিনগুলোতে আসে চুরের দল। প্রতি মাহফিলেই অল্পবয়েসী পুলাপান এই ক্ষেতে আসে। পরশুদিনের মাহফিল। খেতের ভিতর খচর খচর শব্দ হচ্ছে। নিচুস্বরে কথা শুনা যাচ্ছে। আমি আর আরিফ ঢুকলাম ক্ষেতে। দুইডারে পাইলাম ক্ষেতে। ধুমছে পিডাইলাম দুইজনে। কান্দাকাটি হৈ হুল্লোড় কইরা একজন লাফ দিলো বিলে। লাউয়ের মাচা ভাইঙ্গা পড়লো বিলে। রাত তখন ১১ টার বেশি। ছেলের হাতে একটা অ্যাগ্গ্রেড। সেট দামী। পানিত পইড়া কান্ধানি শুরু। আরিফ বাঁশঝাড়ের নিচে লাঠি নিয়া গেলো। সে টের পাইলো ছেলেটা বাঁশ ঝাড়ে উঠতে চাচ্ছে। আগারের মাথা থেকে আরো কুড়ি পচিশ লোক কেমনে জানি আইসা হাজির।

ছেলে রাত ১১ টার পরে পুরা বিল সাঁতড়াইয়া ওইপাড়ে গিয়া উঠলো। হা হা হা।

৭

আমরা বিপন্ন বকের পাশে কাটিয়ে দিচ্ছি সকাল। পাঠশালা থেকে ফিরে খাঁচার কাছে গিয়ে তাকে দেখি। একসময় মনে হলো সে খাঁচায় মানিয়ে নিয়েছে। নির্ধাতিত গৃহবধূরা অনেক সময় বিশ্বাস করে, জন্ম মৃত্যু বিয়ে একবারই হয়।

সেই বিশ্বাস থেকে সারা জীবন তারা নির্যাতন সহ্য করে। পুরুষের জীবনেও এটা সত্য। সামাজিকতার ভয়ে স্ত্রীদের অন্যায় আবদার, স্বৈচ্ছাচারিতা মেনে নিয়ে দারুণ ব্যক্তিগত হতাশায় মুখ খুবড়ে পড়ে এই পুরুষকুল। তাদের কণ্ঠে গান,
জীবন মানেই তো যন্ত্র না, বেঁচে থাকতে বোধ হয়, শেষ হবে না!

এমন বন্দিনী সে নয়। মনে হলো, খাঁচার দিনগুলোতে সে সুখেই আছে। ফ্রি তে খাবার পাচ্ছে। আমাদের ইচ্ছে হলো এই মেঘের মত শাদা পাখিটি আমরা পোষবো খাঁচার বাইরে। এর কারণ আমাদের মনে হলো তার পাখা মেলার দারুণ আকাঙ্ক্ষাটিকে আমরা আটকে রেখেছি।

শাহীন ভাই। সে থাকে ময়মনসিংহ। আমার বড় জেঠা লতিফ দপ্তরীর ছেলে। শান্ত কিন্তু দুর্ধর্ষ। আনন্দমোহন কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে। ছাত্র রাজনীতি করে সে। সরকারি দল। তার দুইটা আগ্নেয়াস্ত্র আছে। একটা পাইপগান, আর একটা রিভলবার। রিভলভারে এক রাউন্ড গুলি আছে। গুলিকে গুলি বলা নিষেধ। গুলিকে ডাকতে হয় "মাল"। ৫ টা মাল সহ এই রিভলবার আমি নিয়ে ঘুরছি। কিন্তু একবার একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়ে ফেললাম।

বকটাকে আমরা খাঁচার বাইরে আনলাম। আতিকুলের বুদ্ধিতে সিদ্ধান্ত হলো তাকে পায়ে বেঁধে রাখা উচিত। পরে ছেড়ে দিতে হবে। তার পাখা মেলার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। আমরা আমাদের শখের পোষা পাখিটি আকাশ বিহারে ছাড়তে রাজি নই। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন,

যাকে ভালবাসো, তাকে মুক্তি দাও।

যে যদি ফিরে আসে, তবে সে তোমার;

যদি না আসে, তবে সে তোমার ছিলো না।

সহজে আমার তাকে ছাড়তে মন চায় না। কিন্তু আমার বন্ধুদের মন আমার চেয়েও ভালো। তারা তাকে ছেড়ে দিলো। বকপক্ষি উড়ে গেলো টিনের চালে। আমার চোখ ছলছল করে উঠলো। সেখানে সে বসে রইলো সারা বিকেল। পরে গেল এক কাঁঠাল গাছে। আমরা ভাবলাম, সে আর ফিরবে না।

বিকালে দেখলাম দিগন্তের ওপারে আকাশ মাটিতে এসে পড়েছে। আতিকুল, নূরুল হক আর আমি। আমাদের ইচ্ছে আকাশ ছোঁবো। দিগন্ত জোড়া পতিত জমির উপর দিয়ে খালিপায়ে দৌড়াচ্ছি আমি। সূর্য ডোবার আগে ছুঁতে হবে আকাশ। প্রতিবার মনে হয় ওই তো। মোড়ল বাড়ির পিছনে নেমেছে মেঘমালা। কিন্তু না, হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দৌড়াচ্ছি। খেতের আইলে উঠা খেয়ে ছিটকে পড়েছি দুই বার। কিন্তু থামলে চলবে কেন? পেছনে প্রায় ৩ কিলো মিটার পথ আমরা ফেলে রেখেছি। আজ বিকালের গোন্নাছুট খেলায় যাইনি। বকটা ফিরবে কি না জানি না। ফেরার কথা না। সেসব মনে নেই। আকাশের মেঘগুলোকে কোলে করে আনবো। আম্মাকে বলবো, এতদিন তুলোর বালিশ বানিয়েছো, এই নাও। আম্মাকে মেঘের বালিশ বানিয়ে দাও। ভাবতেই আরো শক্তি পাচ্ছি।

একটা ছোট বিল। বিলের ধাঁর ঘেঁসে যাবার সময় কাপড়ে শুকনো প্রেমকাঁটা এসে লাগলো।

রিভলবার নিয়ে আমি এদিক সেদিক ঘুরছি। ম্যাক্সিন লোড করা আছে। বন্দুক যেন কেউ না দেখে সেই শর্তে আমার হাতে দেয়া হয়েছিলো সেটি। আমি সন্তর্পনে ঘরে আসলাম।

আব্বা রাতের ট্রেনে বাড়ি ফিরেছেন। ফজরের নামাজ শেষে ঘুমিয়ে আছেন। তিনি একটু একটু নাক ডাকেন। আমি ঢুকলাম কক্ষে। আব্বার মাথায় ঠেকালাম পিস্তল। ট্রিগারে আঙুল রেখেছি। চাপ দেয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি জানি না। এই চাপের ফলে কি হতে যাচ্ছে।

শাহীন ভাই নিজেও একটা আতঙ্কে আছে। তার কাছে কোন আবদার করলে সে চেষ্টা করে ব্যাপারটি সমাধান করতে। আজ এই দুর্ধর্ষ কাজটি আমার মতো একজনের দ্বারা হবে, তা যে কারোরই কল্পনার অতীত। যে যার যোগ্য নয়, তা তার পাওয়া উচিত নয়। যেমন আমার হাতে রিভলবার!

আমরা দৌড়াতে দৌড়াতে পৌঁছে গিয়েছি গয়েশপুর। একজন বৃদ্ধ হাটুরে আমাদের ব্যাপারটি আন্দাজ করলেন। রেললাইনের পাশ ঘেষে সোজা একটা কাচা রাস্তা। বাজারের একটু পশ্চিমের দিকে কৃষি কর্মকর্তাদের আর্চ ছাদের লাল ইটের সরকারি কোয়ার্টার ঘর। ঘরগুলোর পাশে একটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

বর্তমানে অবশ্য এটা এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র। নকলের স্বর্গরাজ্য বললে অবশ্য কিছুটা সুবিচার হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেসবের আমীর। তিনি নিজ দায়িত্বে এসব টুটলীর স্বচ্ছ প্রবেশ নিশ্চিত করে থাকেন। পড়াশোনা যা হয়, সেসব পরীক্ষার হলে বসেই!

হাটুরে বললেন, "আরে বোকার দল, এই আকাশ কোথাও নামে নি! দূর থেকে এমনি লাগে। মনে হয় এই বাড়ির পিছনে নেমেছে। পরে সেখানে পাও?"

আমরা বললাম, "না তো!"

আমার মেঘের বালিশ বানানোর ইচ্ছা মাঠে মারা গেলো!

বাড়ি ফিরতেই পায়ের ব্যথায় অস্থির। তবু একটা বিষয় ভেবে মন ভালো হয়ে গেল।

পা ফুলে গেছে হেঁটে হেঁটে। ১০ কিলো হেঁটেছি কমপক্ষে। মা পায়ে তেল মালিশ করে দিলেন। আর আমার বোকামির জন্য বললেন, "অ্যাঁই পাগলরে নিয়া যে কই যাই!"

মন ভালো হলো যে কারনে, সেটি বলা যাক।

বক ফিরে এসেছে!

আমরা বাড়ি ফিরে দেখি আবছা অন্ধকারে সে খাঁচার পাশে বসে আছে। রান্নাঘরের পাশের ডালিম গাছে সে বসেছে। আমরা তাকে আদর করে খাঁচায় ভরে দিলাম। কিন্তু শরীর অবসন্ন। মেঘ না ছুঁতে পারায় মন বিষন্ন।

আমার উপস্থিতিতে আব্বা জেগে উঠলেন। কী এটা? আব্বা এমনভাবে আঁৎকে উঠলেন, ভয় পেলাম। আমাকে খুন করতে এসছিস? আমার ছেলে? ঝর্ণা? এই তোমার ছেলে?

আমি ঘটনার আকস্মিকতায় ভড়কে গেলাম। হড়বড় করে বলে দিলাম ঘটনার আদ্যোপান্ত। আব্বা শাহীন ভাইকে কষিয়ে একটা থাপ্পড় মারলেন। আমার তার সাথে মেশা নিষিদ্ধ হলো। আর রিভলবারখানা বাজেয়াপ্ত হলো!

ঝর্ণা নামে যেই মহিলাকে আমার বাবা ডাকেন, তিনি আমার মা। পূর্ণনাম মাহবুবা ইয়াসমিন ঝরনা। সার্টিফিকেটে ঝর্ণা খানম। আমার জীবন্ত পাঠশালা। তিনি জাতীয় সংগীত এত সুন্দর গলায় গান, ইচ্ছে হয়, ইশ! আমিও যদি পারতাম! আমি তেমন পারিনা। তাঁর হাতের লেখা অতি নান্দনিক। আমি তার লেখার উপর হাত ঘুরাই। কিন্তু নিজের ইচ্ছেতে লিখলেই বকের ঠ্যাং হয়। ঠ্যাং তাও দুটো সমান। আমার লেখা সেরকম নয়। আকার ও আকৃতিতে বিস্তর ফারাক।

৮

এবারের ঈদে শাহীন ভাই আর আমরা রাইফেলের শব্দ শুনবো। সে একটা স্টেনগান এনেছে। কালো রঙের এই স্টেনগানটাও আমার ভাল লাগলো। কিন্তু সে আর আমার হাতে বন্দুক দেবে না এটা ফাইনাল।

আমি তাকে আমাদের পাখি দেখালাম। সে বললো, পাখি মারবি? আমি বললাম, না। পাখি মারি না। তুমিও মারবা না। আমরা এই এলাকায় পাখি দেখে রাখি।

সে বললো আমার বন্দুকে পাখি মারা যাইবো না। আওলাইয়া যাইবো।

দুপুরে আমরা মাছ ধরি। চৈত্র বা ফাল্গুনে আমরা ডোবা বা খাল সেচি। অল্প পানিতে সারি ধরে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে পানি টানি। দুই পায়ে ফাঁকে কাদায় একটা গর্ত থাকে। সেখানে এসে বসে পুঁটি মাছ। কিছু প্রজাতির পুঁটি মাছের মাঝে একটা লাল দাগ থাকে। সেগুলোকে আমরা বলি বিবাহিত পুঁটি।

আমরা মাছ ধরছি। আমাদের সাদা বকটি আশেপাশেই কোন গাছে বসে আছে। উড়ে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। আনন্দিত ও নির্ভয়। আমাদেরও ভাল লাগছে। আমরা যেন একটা প্রেরনা পাই তাকে দেখলে।

একবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। পূর্ণ দুপুর আমরা মাছ খুঁজেছি। একটা তিতপোনাও পাইনি। মন ভীষণ খারাপ। মিশন ফেইল করেছে। খৌরাইল বিলের দক্ষিণ পশ্চিমে একটা ছোট খাল আছে। সেচের মেশিন যেন পানি পায়, সেজন্য সেটা বানানো হয়েছে।

সালেহ মোহাম্মদ আমাদের মধ্যে বড়। আমাদের একটা নিয়ম ছিলো। ৩ জন এক সাথে চললে একজন দলনেতা থাকবে। সেও আমাদের বন্ধু। কিন্তু কোন সমস্যা বা কথা থাকলে সে আগে বলবে। পথে সে আগে চলবে। সে স্কনিকের নেতা। এটা আমাদের একটা অলিখিত নিয়ম। পরিস্থিতি বিবেচনায় মাঝেমাঝে আমরা নেতাদের কথা শুনতাম না। নেতা মানতাম না। কিন্তু আসলে চলার পথে নেতা ছাড়া কি বিপদ হয় সেটা আমরা পরে দেখেছি। অযোগ্য লোককেও সাময়িক নেতা বানালে তার অযোগ্যতা ধরা পড়ে। সেটার দরকার আছে।

আজ সালেহ আমাদের নেতা। নেতা মানে, সে সামনে থাকবে। আর কিছু না।

হারুন নেমেছে খালে। লাল হাফপ্যান্টটি হাতে ধরে আছে তার। শরীরে একটা সূতাও নেই। আমি একটা নীল হাফপ্যান্ট পড়েছি। জিপ্সের।

জিপ্সের প্যান্ট পড়লে একটু ঝামেলা হয়। চেইন মাঝে মাঝে একটা বিশেষ জায়গায় আটকে যায়। টুনটুনি পাখির বাসা থেকে ছানা নিয়ে আসার জন্য নাকি এমন হয়! একবার

তো এই ঘটনায় আমি যারপরনাই ব্যথিত হলাম। শ্রদ্ধেয় আবু সাইদ হুজুর (আমার প্রথম আরবী শিক্ষক) আমার চেইন থেকে আমাকে বাঁচালেন। আমি ছানা আনা ছেড়ে দিলাম।

একবার প্রাইমারি স্কুলে এই ঘটনা ঘটলো। আমি এক হাত ধরে আছি, আর এক হাতে চোখ মুছছি। চাচাতো ভাই নূরুল হক বললো, হাত সরা। আমি বললাম, না। আমারে বাড়িত পাঠাও। সে জোড় করে হাত সরালো। এমন এক টান দিলো, আমি চিৎকার দিলাম। সে বললো, যেদিন টুনটুনি বোল্লা (বাজপাখি) হইবো, তোর আর কষ্ট থাকবো না! (এখন অবশ্য কষ্ট নাই 😊)

এসে গেলো হেড স্যার। বললেন, কি হয়েছে? What Happened?

নূরুল হক বললো, স্যার পক্ষী ফান্দে আটকা পড়ছিলো।

সারা ক্লাস ছুঁ করে হেঁসে উঠলো। লজ্জা পেলাম।

হারুন জন্মদিনের পোশাক পড়ে খাল দিয়ে হাঁটছে। সে আছে প্রথমে। পরে আমি এর পরে সালেহ।

"ওরে বাবা গো, আমার পুঙ্কু খায়ালছে!" বলে এমন চিৎকার দিলো হারুন, রাস্তার মানুষ ও এদিকে তাকিয়ে গেছে। দূর থেকে কাজল ভাই বললেন, কি হইছে রে!

শোল মাছ হলো মৎসখেকো মাছ। টাকি মাছের ছোট পোনা ভেবে দুই পায়ের মাঝে এসে হামলে পড়েছিল একটা বড় শোল মাছ। হারুন ভালোই ব্যথা পেয়েছে বলে মনে হলো। আমি খালে বসে পড়লাম। ছোট খাল। হাত পা মেলে বসলেই পাশাপাশি ৭০% অংশ আটকানো যায়। আমাকে টপকে মাছ আঘাত করলো সালেহ মোহাম্মদের হাঁটুতে। লাফ দিয়ে উঠে গেল ডাঙায়। সালেহর হাতে থাকা গেঞ্জি দিয়ে ধরে ফেললো প্রকাণ্ড শোল মাছ। আমরা পরে ভাগ করে নিলাম।

একটা অংশ পেলো আমাদের বক। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখন সে খাঁচার কাছে এসে বসে। বাড়ির গৃহিণীরা যেমন হাঁস-মুরগী ঘরে দেয়। আমাদের দিতে হয় এই বকটাকে খাঁচার মধ্যে।

১০

দেখতে দেখতে বকটা বড় হয়ে যাচ্ছে। টেম্পেস্ট গল্লে প্রসপের নামক একজন জাদুকর থাকে। সেই জাদুকরের আঙািবহ থাকে এক প্রেত। সে ঝড়ে পড়া পাতার উপর গুটিগুটি করে শুয়ে থাকে। বাতাসের শব্দের সাথে মিশে শিশ বাজিয়ে বনের গাছের আড়ালে উঁকি মেরে গান গায়।

এই বকটা আমাদের সঙ্গী। আমাদের নিত্য সহচর।

পড়ন্ত বিকালে আজ আমরা গোল্লাছুট খেলেছি। আমার পায়ে ব্যথা পেয়েছি। সদ্য কাটা ধানক্ষেত। টনটনে শক্ত মাটি। মাটিতে কৃষকের পায়ের গর্ত পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। আমি দৌড়াচ্ছি। আমার সামনে দৌড়াচ্ছে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা। আমার পা পড়লো সেই কৃষকের পায়ের গর্তে। আমি থপ করে পড়ে গেলাম। ব্যথা পাচ্ছি।

আবুল হাসেম দগুরীর পাশে শুয়ে আছি। ক্লান্ত শরীর। চোখে রাজ্যের ঘুম। অস্রাণের ধানের গন্ধ ভেসে আসছে। বৈরাগী বা বতক ধানের স্রাণ।

আমি আধো আলো আধো অন্ধকার একটা স্থানে হাটছি। মনে হচ্ছে আজ হাটবার। নতুন বাজারের হাটুরেরা বাড়ি ফিরছে। বাজারে নালবাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। পেইলাক রঙের কৌটায় কেরোসিনের বাতিগুলো জলছে। একটা মুড়ি মুড়কির দোকান আছে বাজারে। আমি দাদার সাথে সেই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বকটা এসে আমার ঘাড়ে বসলো।

আমি বললাম, এই রাইতে তুই বাজারে আইলে কেয়া?

বাজারের উপরে শতবর্ষী বটগাছ। গাছের ছায়ার ফাঁকদিয়ে জোসনাদার আলো এসে পড়ছে। একজন ছোট বাচ্চা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বললো, দেখ, কি সুন্দর বকপক্ষী!

চল আমরা নিয়ে যাই।

সে বকটাকে খপ করে ধরে ফেললো। বকটা চিৎকার করছে। তারা বলছে, "আহা এর রান দুইটা হেবি লাগবে রে!

লাফ দিয়ে উঠলাম ঘুম থেকে। দাদা জোরে বললেন, কি হইছে?

আমি বললাম। দাদা কয়টা বাজে?

সাড়ে আটটা।

আমি মূতবো।

যা। ডরাইবি?

না। আমি ডরাই না।

বলেই দৌড়ে গেলাম খাঁচার কাছে। সাদা বক। ভিতরে শুয়ে আছে। খাচার একটা শলা ভেঙে গেছে। আমি কাঁদোকাঁদো স্বরে বললাম। প্রিয় পাখি, তুই আমার চোখের আড়াল হইস না!

১০

আগামীকাল বৃহস্পতিবার। আমরা প্রতি বৃহস্পতিবার মারামারি করি। আগামীকাল মারামারি হবে দেউলপাড়ার সাথে। আমার প্রস্তুতি বেশি ভালো না। পায়ে ব্যথা। মন মেজাজ ও ভাল নেই। দেউলপাড়ার নেতা হইলো আলিফ। রোল এক। চিকন চাকন একটা ছেলে। শক্তি নাই। কিন্তু ভাবে পা মাটিতে পড়তে চায় না। তার এক ভাই জুলজিতে পড়ে। জুলজি কী তা জানিনা। তার একটা সুন্দর ক্যালকুলেটর আছে। সায়েন্টিফিক না কি যেন নাম। অনেকগুলো বোতাম। উল্টাপাল্টা চাপলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার রিস্ক আছে। তাই সেটা অন্যদের ধরা মানা। তাদের দলে দুস্টু কিছু পুলাপান আছে। চান্দু আল আমিন, পুঙ্কু কাটা আনোয়ার

সবার আগে খতনা করিয়েছিল। সে যে সত্যিই খতনা করেছে সেটা পুরা স্কুলে সে প্রদর্শন করে! তাই এই নাম!) সব ছেলেদেরকেই দেউলপাড়া টিমে নেয়া হয়েছে। আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে বড় ছেলে আছে দুইজন। আনিস আর নুরুল হক। আনিসের চাচাত ভাই শেখ ফরিদ। সে প্রায়ই একটা হলুদ রঙের চকচকে কলম নিয়ে আসে। আর সেটা তার স্কুল ড্রেসে কালি বমি করে দেয়। সে কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে, স্যার গো কলমে আইগ্যা দিছে। তার নাম দেয়া হলো, আগা ফরিদ!

অবাক হয়েছি একটা ব্যাপার দেখে। আমাদের মেজাজ বেশি একটা ভাল নেই। আমরা দল বানাতে পারি নাই। অনেকেই দলে ভিড়েছে। কিন্তু মাইর শুরু হওয়ার পরে দেখা যায় তারা আমাদেরই মারতে আসে। কাকে যে বিশ্বাস করবো বুঝতে পারি না।

আমরা শিখলাম যুদ্ধে অন্ধ বিশ্বাস বলতে কিছু নাই।

অবাক হলাম। যখন শপথ নিলাম তখন দেখি আনিস ওদের সাথে জয়েন করেছে। আমার পায়ে ব্যথা। আমরা বলতে, নুরুল হক, আতিকুল, সালেহ মোহাম্মদ, আমি, অনাহার।

সকাল ৯ টা। স্থান দেউলপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিক। একটা বাঁকা আম গাছের নিচে আমরা জড়ো হয়েছি। আমরা আলাপ করছি। অচেনা একটা ছেলে দৌড়ে এসে ঘুষি দিতে চাইলো। ব্যাপারটা নজরে পড়লো আমার সামনে থাকা নুরুল হক এর। সে লাফ দিয়ে সরিয়ে দিলো সৈন্যটাকে। বুঝলাম মারপিট শুরু হয়ে গেছে। যে যাকে পেলাম মারলাম। আমি দৌড়াতে পারছি না। আমার পিঠে একটা ঘুষি লাগলো। জায়গাটাতে রক্ত জমে যাচ্ছে। যে ছেলে এই কাজ করেছে, তার নাম নবী হোসেন। ভালো ছেলে। আমার বন্ধু।

দেউলপাড়ায় আর একজন সাহসী কিন্তু শান্ত ছেলে আছে। নাম তার আশরাফুল। দোহার গঠন। হাত পায়ের গোছা মোটা। ভাল কাবাডি পারে সে। সাহসীও বটে। মারামারিতে সে ও পাক্কা। তবে সহজে তাকে দলে ভেড়ানো যায় না।

সে আমাদের ক্লাসের সব ছেলেকে যোহরের নামাজে যেতে উদ্ধুদ্ধ করে ফেলেছে। আমরা এমএন দাদার মসজিদে নামাজ পড়ি।

ওজুতে কীভাবে নাকের ভেতর নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছানো যায়, সেটা সে শেখায়। মাথাহ মাসাহ করার পদ্ধতি শেখায়।

এক সময় দেখা,গেলো ক্লাসের সব ছেলেই মজিদে নামাজ পড়তে আসে। মসজিদে এসে আমাদের অনেক বন্ধু হয়ে গেলো।

যাদেরকে মার দেয়ার জন্য সারা সপ্তাহ প্ল্যান করতাম, তাদের সাথে সৌহার্দ্য সৃষ্টি হলো। আস্তে আস্তে আমরা মাইর ছেড়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু দলনেতা নূরুল হক হইলো জুম্মা নামাজী। সে আমাদের সাথে মসজিদে এলো না। আমরা এবার এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের মাইর হবে এমন প্লান চললো। কিন্তু আমরাও মাইর ছেড়ে দিতে চাইলাম। খুব সম্ভবত নামাজে নিয়মিত হবার জন্যই আমরা মারপিট ছেড়ে দেই।

কেউ গায়ে পড়ে লাগতে আসলে শুধু বলে দিতাম, অস্ত্র জমা দিছি। ট্রেনিং জমা দেই নাই!

এতেই কাজ হতো।

যার ওসিলায় আমরা সহিংসতা ছেড়েছি, সেই আশরাফুল এর সাথে আর কোনদিন দেখা হবে না। দেউলপাড়া গ্রামের কাঞ্চন স্যারের বাড়ির সামনে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে আমার সাহসী বন্ধুটি। সিলেট পল্লী বিদ্যুতে চাকরি হয়েছিলো তার। বিদ্যুতের লাইনে ঝুলে ছিলো পরোপকারী এই আশরাফুলের লাশ। হায় আশরাফুল! আমি তোমাকে কখনোই ভুলি না।

শেষ

আজকে সকাল থেকে আমার খুবই মন খারাপ।

মন খারাপের কারণ অজানা। সম্ভবত আঝা বাড়িতে আসার কারণে। আঝা সারাদিন আমাকে নসীহত করবেন। চোখের আড়াল হতে দিতে চান না। আবার, আদবের বরখোলাপ ও করতে দেন না। আমাকে তিনি ভালবাসেন না ঘৃণা করেন আমি সেটা জানি না। কতবার আমাকে কাঁদিয়ে তিনি মসজিদে নিয়ে গেছেন। মাইক অন করে কান্নাভরা কণ্ঠে গজল গাইতে বলেছেন তার শেষ নেই।

বক দেখেও তাঁর খারাপ লাগলো। নিরীহ পাখিটিকে কেন আটকে রাখি, এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো। আমি বললাম, আমরা রাখি না। সে থাকে।

বক ছেড়ে দিয়েছি। একটু বৃষ্টি হয়েছে দুপুরে। সবাই স্কুলে। আজ বকটাকে খুব মনে পড়ছে। স্কুল থেকে বাড়ি চলে যাবো?

না। বাড়িতে এখন গেলেই বিপদ। বাড়ি ফিরলাম ৪ টার একটু পর। এসেই মনটা ছুঁ করে উঠলো। এই মুহুর্তে বকটা আশেপাশে থাকার কথা। আমি ডাক দিলাম, টুক,টুক...

কোন পাখা ঝাপটানোর শব্দ নেই। খুব খারাপ লাগছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। খাঁচা শূন্য। খুব অস্থির লাগছে। সামান্য একটা বকের জন্য কি এত খারাপ লাগা উচিত?

দুই সপ্তাহ আগেও তো একটা বক জবাই করে খেয়েছি। কই খারাপ লাগে নি তো! বরং মনে হয়েছে পাখির মাংস তো "very Testy".

বক সেই সন্ধ্যায় আর ফেরেনি। রাতে ঘুমুতে পারিনি।

সবাই বললো, খেতে খেতে হয়ত ভুলে গেছে রাস্তা। মুখ তুলে যখন দেখেছে আকাশপথ, হয়ত সে পথ ভুলেছে। ফিরতে পারেনি। উত্তর বাগের কোন বাঁশঝাড়ের ডগায় হয়ত কাটিয়ে দিয়েছে রাত।

খারাপ লাগা একটু কমেছে। কিন্তু ওকে একবার আমি দেখতে চাই। উত্তরবাগে গেলাম। আমাদের পুরোনো গুরস্থান। আগে হিন্দুদের শশ্মানঘাট আর চিতাশাল ছিলো। ১৯৪৭ সালে ওরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। মুসলিমদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের ফলে আঞ্চলিক জনগন অনিবার্য বিপ্লবের অবতারণা করে। অত্যাচারীরা পলায়ন করে।

সেখানে একটা ছোট নালা। নাম দাইড়। দাইড়ের পারে দুইটা বক। কিন্তু আমাকে দেখেই উড়ে গেলো। মানে এই বকেরা অপরিচিত।

স্কুলে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আমার বকটা তোরা দেখছিস?

এভাবে দিনটা চলে গেলো। বক আর এলো না। একটা সময় রাগ হলো। আমি যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি। বেয়াদব, তোর কি দয়া নাই? একবার শুধু ফিরে আয়। পরে চলে যাইস। আমি শেষবার তোরে ছুঁয়ে দেই। প্লিজ।

বক আসে না।

পরদিন এলাকার এক বড় ভাই বাজারের দিকে যাচ্ছে। আমি যাচ্ছি তার পিছনেই। তার সাথে আরেকজন লোক। তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করছে। এক সময় প্রসঙ্গ মোড় নিলো।

" ব্যাডা পরশুদিন আমি আমার পুঁটির জালডা দাইড়ে পাতলাম। দেহি একটা গুস্তাল বক বাইজ্জা রইছে। মাছ খাইবার আইছিল হালারপুতে। বিরাট মজার মাংস! বক খাইছিস জীবনে?"

আমার চোখ ছলছল করে উঠলো। সেই বকের গলার উপর যখন শানিত ছুরি, নিশ্চয়ই সে আমার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছে। ভাবতেই আজোও,এই ২০ বছর পর আমার সেই বকের কথা মনে পড়ে। কাঁঠাল গাছে আজ এই বক দেখে আবার আমার হৃদয় খুঁড়ে জেগে উঠে বেদনার ঢেউ!